উক্য চিং

একজন আদিবাসী বীর বিক্রমের দুঃখ গাঁথা

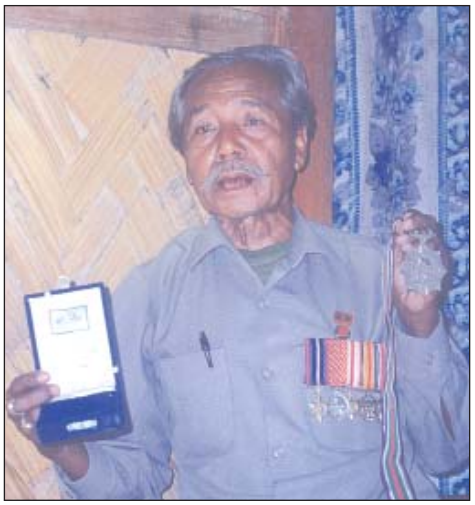

উক্য চিং বীর বিক্রম। মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাস যার হাতে গর্জে উঠেছে শত্রুসেনা ধ্বংসের হাতিয়ার। এবার বিজয় দিবসে পেলেন ১০০ টাকার প্রাইজবন্ড : লজ্জিত, ক্ষুব্ধ, হতাশ এই বীর মুক্তিযোদ্ধা...

সুমি খান *বান্দরবান থেকে ফিরে*

'বাংলাদেশ মাটির মর্যাদা জানে, আমার মর্যাদা জানে না। প্রাণ বাজি রেখে এই মাতৃভূমি 'আজাদ' করেছি, বিনিময়ে না খেয়ে মরছি। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মেডেল দিয়েছেন, কোনো টাকা দেননি। সেই মেডেলও সিঁধ কেটে চোরে নিয়ে গেছে। এখন যে মেডেলটা আছে সেটা কি রান্না করে খাবো? আমার সন্তান পাহাড় থেকে লাকড়ি কেটে আনে, আমি পরিবার নিয়ে উপোসে মরি। খোদার কসম, আমার টাকা-পয়সা নাই, ভিক্ষা করে খাই। আমার ছবি নিয়ে কী হবে? আপনাদের পত্রিকা বিক্রি হবে। অ-নে-ক জন ছবি নিয়ে গেছে, কিন্তু আমি এখনো উপোস করে মরছি...''- স্বাধীনতার ৩৩ বছর পরও ২০০৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর নিজের বাড়িতে বসে এভাবেই ক্ষোভ ঝাড়লেন মুক্তিযোদ্ধা উক্য চিং বীর বিক্রম।

উক্য চিং বীর বিক্রম। '৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যার হাতে এলএমজি, গ্রেনেড, মর্টার গর্জে উঠেছে বারবার। মাতৃভূমিকে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে স্বাধীন করতে মরণপণ যুদ্ধে যিনি ১৩ জন সদস্য নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। দুঃসাহসী এ যোদ্ধার প্রতিটি অভিযান শত্রুসেনার ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে। একের পর এক বর্বর পাকিস্তানি সেনারা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। বাঙালি নারীদের ওপর পাক সৈন্যদের বর্বর নির্যাতনের প্রতিবাদে যিনি পাকবাহিনীর ১ কমান্ডারসহ সাত সেনাকে ধরে পুরুষাঙ্গ কেটে হত্যা করে রাস্তায় শুইয়ে রেখেছেন, তিনি বাংলাদেশের ১৭৫ জন বীর বিক্রমের একজন। তিন পার্বত্য জেলার একমাত্র আদিবাসী বীর বিক্রম তিনি। অথচ এই বীর যোদ্ধাকে এবারের বিজয় দিবসে বান্দরবান টাউন হলে ১০০ টাকার প্রাইজবন্ড দিয়ে সম্মানিত (!) করা হলো। অশ্রুসজল চোখে উক্য চিং বীর বিক্রম প্রশ্ন রাখেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে, 'কেন এই প্রাইজবন্ড দিয়ে আমাদের লজ্জা দেয়া?'

ফৌজের জীবন ও মুক্তিফৌজ

'৫২ সালে ইপিআরে রাইফেল জীবন শুরু। '৮২ সালে সুবেদার হিসেবে অবসর গ্রহণ। মধ্যবর্তী সময়ে উক্য চিং-এর বর্ণাঢ্য সামরিক জীবন।

ইপিআর সুবেদার মেজর মং চিনু ছিলেন উক্য চিংয়ের ভগ্নিপতি। তিনি '৫২ সালে উক্য চিংকে নিয়ে যান ইপিআর বাহিনীতে। ইংরেজ জেনারেল বললেন, 'ভালো হয়েছে তুমি এসেছো, এই বাহিনীতে আমাদের আদিবাসী দরকার।' ১০ জন আদিবাসী নিয়ে উক্য চিং একসঙ্গে যোগ দিলেন '৫২ সালে ইপিআরে।

বোমাং রাজার স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণী পাস উক্য চিং ১৮ বছর বয়সে ৪৫ টাকা বেতনে কর্মজীবন শুরু করেন। এক বছর পর এ বেতন বেড়ে হয় ৭৫ টাকা। '৭১ সালে নায়েক পদে ছিলেন। যুদ্ধ চলাকালেই হবিলদার পদে প্রমোশন হয়।

হকি, জুডো, কারাতে খেলায় পারদর্শী ছিলেন। জাতীয় দলে খেলেছেন হকিতে। স্মৃতিচারণে আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, 'ইপিআর থেকে আমি না গেলে হকিতে স্কোর হতো না। আমরা তিনজন খেলোয়াড় দলে থাকলে কখনো হেরে আসিনি, চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছি।' সেফ্‌ট-ইন্‌য়ের হকি খেলোয়াড় উক্য চিং বীর বিক্রম বললেন, 'দ্যাখেন, করাচি থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসে '৭১ সালে কেমন গোল খেয়ে গেল পাকিস্তানিরা!' বলেই হা-হা করে হেসে উঠলেন। কথা বলছেন আর বুকে ঝোলানো মেডেলগুলো ঝন্ ঝন্ করে উঠছে- এ যেন তাদেরও কথার মিলিত প্রতিধ্বনি।

'৯২ সালে বিডিআর কমান্ডারকে একটা দরখাস্ত দিই। আমার ঘরবাড়ি নাই। বরাদ্দ হলো ৮৭ হাজার টাকা।' স্থানীয় ঠিকাদার সরকারদলীয় লোকেরা দায়সারা করে তৈরি করেছে যে বাড়ি, তাতে স্যানিটেশনের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। বেড়ার ঘরের নিচের দিকে সিমেন্ট লাগিয়ে দিলে সিঁধ কাটা এবং ভঙ্গুর অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সবদিক থেকে কিছুটা নিরাপদ হয়। উক্য চিং বীর বিক্রম বারবার বলার পরও সেটা করেনি। তার এক বছরের মধ্যে মেডেল চুরি হয়ে যায় সিঁধ কেটে। এই মেডেলের প্রতিরূপ কি দেবে এই সরকার? বাড়ির সামনে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও কিছু লেখা হয়নি। সবই দায়সারা। পৌরসভা থেকে কোনো রকম একটা টয়লেট করে দেয়া হয় কিছুদিন আগে। বান্দরবান শহর থেকে ৩ কি.মি. পথ হেঁটে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করেন উক্য চিং বীর বিক্রম। তার আবেদন সিএনজি। যদি প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন দেন, অনেক কষ্ট তার লাঘব হবে।

হয়তো উক্য চিং বীর বিক্রমের বীরত্বের ইতিহাস সংবাদপত্রে কিছু এসেছে, তবু অপরিবর্তিত পরিস্থিতি আর কঠিন বাস্তবতায় এই বীর যোদ্ধা চরম হতাশায় ডুবে আছেন। সাপ্তাহিক ২০০০কে তিনি বলেন তার সব কথা। মরণপণ সম্মুখ সমরের বীরত্বগাথার প্রতিটি স্মৃতি তাকে আলোড়িত করে। জাতির এ সংকটকালীন এই বীর যোদ্ধার যোগ্য

সম্মান বেঁচে থাকার একটু নিশ্চয়তা কি খুব বেশি চাওয়া? ৭১ বছর বয়সে এখনো জুডো, কারাতে, হকির সব কৌশল চোখের পলকে দেখিয়ে দেন। তার বাড়ির সামনের প্রায় ৩ কি.মি. রাস্তায় ৪টি ব্রিজসহ কাজ চলছে। একদিন হয়তো এ কাজ শেষ হবে। যে রাস্তার নাম হওয়া উচিত উক্য চিং বীর বিক্রম সড়ক। জীবদ্দশায় কি তিনি দেখে যেতে পারবেন এ নামকরণ?

এডামুই পাইং সংঘ থেকে গত তিন বছর ধরে উক্য চিং-এর নামে মেধা বৃত্তি চালু হয়েছে। সাধারণ জ্ঞানের ৪৫টি প্রশ্ন প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। পরীক্ষার সময় ও পুরস্কারের সময় অতিথি থাকেন উক্য চিং বীর বিক্রম। এছাড়া এই সংগঠনটি যার নামে বৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে গত তিন বছর ধরে, তাকে যেন চেনে না!

এডামুই পাইং সংঘের অর্থ সম্পাদক হিসেবে স্বাক্ষর আছে অং থুই চিংয়ের। এদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে কাউকে পাওয়া যায়নি। উদ্যোক্তা সংগঠন হিসেবে যার নামে এ মেধাবৃত্তি, তাকে এমন নির্লজ্জ অবহেলায় বিস্মিত উক্য চিং বীর বিক্রম নিজেই। মেধাবৃত্তির নামে 'ব্যবসা' নয়, প্রয়োজন উক্য চিং বীর বিক্রমকে প্রকৃত মর্যাদায় উপস্থাপন। এদের প্রকাশিত ৪৫টি সাধারণ জ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নের কোথাও নেই উক্য চিং সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন। প্রথম শ্রেণীর স্কুল ছাত্র 'অনীক' জানে না কার নামে এ বৃত্তি, কেন এ বৃত্তি, কী তার ভূমিকা?

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো যেভাবে শুরু
উক্য চিং বীর বিক্রমের ভাষায়

পাঞ্জাবি সুবেদার সমুন্দর সিংয়ের নির্দেশে বর্ডারে যাত্রা

যুদ্ধের শুরুর দিকেই ঢাকা ছেড়ে রংপুরে যেতে হলো। পাঞ্জাবি মেজর সমুন্দর সিং উইং কমান্ডারের সঙ্গে আলাপ করে পাঠিয়ে দিলো বর্ডারে। ৪-৫ মার্চ আমরা ১৩ জন হাতীবান্ধা যাই। পাটগ্রাম 'বিওপি' সীমান্ত চৌকিতে ছিলাম। হাবিলদার মোজাহেরুল হক ছিলেন দায়িত্বে।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা সম্পর্কে বাজারে শুনলাম পিলখানায় হামলা হয়েছে। ২৩ মার্চ চায়ের দোকানে খবর শুনতে গেছি সংগ্রাম কী পর্যায়ে জানতে। সিভিল ড্রেসে এক বাঙালি 'নায়েক' আমাকে দেখলো। বললো, 'ওস্তাদ, আপনি এখানে কী করেন?' বললাম, 'বাবা, তোমাকে তো চিনি না!' তার পরিচয় দিয়ে 'খবর' জানি কি না জিজ্ঞেস করলো। ভনিতা করে বললাম, 'জানি না।' খোঁজ নিলো ক্যাম্পে 'কে' কয়জন আছে। বললাম, ২ বিহারি ও ১ পাঞ্জাবিসহ ১৩ জন। বললো, 'ঢাকায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এখানেও'...

এরপর দেখি আমার সামনে দিয়ে ছই দেয়া গরুর গাড়ি যাচ্ছে। ডাকলাম 'এই গাড়োয়ান দাঁড়াও, কী আছে গাড়িতে?' বললো 'কিছু নাই তো!' দেখি এক পাঞ্জাবি সাহেব গায়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছে। 'কাঁহা যা রাহা হো?' প্রশ্নে বললো, 'Visit মে যা রাহা।' সোজা বিওপিতে নিয়ে গেলাম। ক্যাম্পে আটকে রাখলাম। ইনি নায়েক সুবেদার সমুন্দর সিং। আমাদের ক্যাম্পে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিলেন। ৬টা গুলিসহ পিস্তল নিয়ে তাকে সম্মান দিয়েই বন্দি করলাম। তার পছন্দের খাবার রুটি বানিয়ে খাওয়ালাম। অন্যদিকে আমার ক্যাম্পের ২ বিহারি ও ১ পাঞ্জাবিকেও নজরবন্দি করে ফেললাম। দায়িত্বে বাঙালিরা। বললাম, 'লক্ষ্য রাখবে যেন পালাতে না পারে।'

আমি তখন ঐ বিওপির প্রধান। সকালে গুলি, মর্টার, গ্রেনেড, হাতবোমা সব গুনে রাখলাম। হাবিলদার মাজহারকে বললাম, 'ওস্তাদ এদের রংপুরে পৌঁছে দেন।' সুবেদার সমুন্দর সিংয়ের ৬টি গুলিসহ পিস্তল ফেরত দিয়ে দিলাম। পাঞ্জাবি সুবেদার সমুন্দর সিংকে রংপুরে ছাত্ররা ধরেছে জানলাম, এই ছাত্ররা সেদিন ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছিলো। সমুন্দর সিং পর্যবেক্ষণেই এসেছিলেন দায়িত্ব নিয়ে।

15 wW‡m¤i Ô92 ZrKvjxb cavbgš¿x Lv‡j`v wRqvi nvZ †_‡K exi weµg c`K wb‡"Qb DK¨ wPs

সমুন্দর সিংয়ের গোয়েন্দাগিরির পর বিওপি ছাড়লাম

বাঙ্কারের উপর এলএমজি লাগিয়ে রেখেছি। বাঙালিদের হাতে অস্ত্র দিয়ে পাহারা বসাই। সিপাহিদের বলি, বিকেল ৪টার মধ্যে বিওপি ছেড়ে দিতে হবে। অস্ত্র সব গোডাউনে জমা দেবে, পোশাক বাক্সে রেখে দেবে। সবাই যেন সিভিল ড্রেসে থাকে। তারা প্রশ্ন করলো 'কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তোমরা বাঙালি না? জানো না ঢাকা শহরে পিলখানায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে? এক কাজ করো। জানো তো তিনজন আছে। তাদের কী করতে হবে?'

'সঙ্গে নিবা? না ছেড়ে দিবা?' তারা বললো, 'ওস্তাদ আপনি যা বলেন'। এর মধ্যে বিওপি কমান্ডার মোজাহের তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলো। তাকে বললাম, 'আমি পাহাড়ি, আপনি মুসলিম, কোরআন শরিফ পড়েন। দ্যাখেন কী করা যায়।' তিনি বললেন, এদের নজরবন্দি করে তিনজন ভলান্টিয়ার রাখতে। তিন বাঙালি সিপাহি রাজি হলো ভলান্টিয়ার হতে।

একটা গর্ত করে অস্ত্র, গোলাবারুদ রাখলাম। সবার কাছে শুধু ১টা করে অস্ত্র। আমার কাছে শুধু ১টা এলএমজি। তিন বাঙালি সিপাহিকে নির্দেশ দিলাম পুকুরপাড় দিয়ে যেতে। একটু পর শব্দ পেলাম ঠুস্ ঠাস্।

ভাত খেতে বসে সিপাহিরা কাঁদছে। বললো, 'ওস্তাদ আমরা বাঁচবো না'। বললাম 'কেঁদো না- ভাত খেয়ে নাও- সবার আগে আমি মরবো যদি মরতে হয়।'

স্থানীয় মাতবরকে ২টা গরুর গাড়ি ঠিক করতে বললাম, ভোর ৪টায় বেরুবো। কোথায়, কেন, কিছুই বললাম না। সময়মতো ২টি গরুর গাড়ি এলো। ৫০ রাউন্ড করে গুলি সবার হাতে দিয়ে ভোর ৪টায় রওনা দিলাম।

সকাল ৮টায় মঙ্গলহাট পৌঁছলাম। লালমনিরহাটে কোম্পানির হেডকোয়ার্টার। ওখানে বিওপিতে কেউ নেই। কোম্পানি সুবেদার আরব আলীসহ সবাই ভারতে চলে গেছে জানলাম। নৌকায় তিস্তা পার হলাম ব্রিজের নিচ দিয়ে।

প্রথম যুদ্ধ অভিজ্ঞতা

ব্রিজ পেরিয়ে যেতেই ভারতীয় রেলস্টেশন। ওখানে একটা প্রাইমারি স্কুলে ঢুকলাম। নিচুস্বরে স্থানীয়দের বললাম, ২টা গরুর গাড়ি দরকার। মালপত্র, রেশন নিয়ে এক জায়গায় যাবো। সকালে গরুর গাড়িতে সোনারহাট চলে গেলাম। কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আরব আলীসহ সবাইকে পেলাম।

সেখানে শতাধিক মুক্তিবাহিনী ও ইপিআর।

কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আরব আলীকে বললাম, তিনজন তো শেষ। অসুবিধা হবে? বললেন, কোনো অসুবিধা হবে না। তিনি খুব খুশি হলেন সবাইকে পেয়ে। হাবিলদার, নায়েক, ল্যান্স নায়েকসহ মিটিংয়ে বসলাম। স্কেচ করলাম চক দিয়ে এঁকে। পরিকল্পনা নিলাম যার যার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে।

২৫ জনের মতো সঙ্গে দিয়ে আমাকে দেয়া হলো কোলাঘাটে। লালমনিরহাট থেকে খেয়াঘাট পেরিয়ে গেলাম। সেকশন নিয়ে ডিফেন্স দেবো। আমি তখন টিম লিডার। খালের কিনারে বড় বড় বাঙ্কার করলাম। এতে ক্যামোফ্লেজও করা যায়, বোমা পড়লেও ভাঙে না।

কোনো খানা দরকার নেই। বেতন দরকার নেই, ঘরের দরকার নেই। বাংলাদেশের মাটিকে আজাদ করে ছাড়বো- এই শপথে আমরা যুদ্ধে নেমেছি।

একই পাড়ের এক প্রান্ত থেকে সারা রাত মর্টার ছোঁড়া হলো। পরদিন রাত ৮টা থেকে আবার শুরু হলো। দলের সবাইকে বললাম, 'চুপচাপ থাকো সকালে দেখা যাবে।' আমরা জবাবও দিইনি, ক্ষতিও হয়নি। জবাব দিলে আমাদের অবস্থান টের পেয়ে যেতো।

সকালে জায়গাটা রেইকি করলাম। আধা মাইলের ওপর এগিয়ে গেলাম। শত্রুকে পেলে ছাড়তে নেই। অসুবিধা আছে, তাদেরকে ছাড়তে পারে না। পাঞ্জাবিরা রাতে সামনে এগোয় না। দূর থেকে মর্টার ছোঁড়ে। বাঙালিদের এরা ভয় পায়। জানে তো আমরা Hit and Run নীতি অনুসরণ করি। এগিয়ে বাঙ্কারের ভেতরে কাউকে পেলাম না। সবাই পালিয়েছে। দু'জন সিপাহি সঙ্গে নিয়ে এগোলাম। বললাম, 'সামনে যেই আসুক ক্ষমা নেই। পেছনে এলে বুঝবে আমাদের লোক।' যাই হোক, কাউকে ধরতে না পেরে মেজাজ খারাপ হলো।

পাসওয়ার্ড বলতে হতো- 'আমগাছ দাঁড়াও। উত্তর হতো- 'হ্যাঁ কাঁঠালগাছ'।

পরদিন সকালে দেখি বাঙ্কারে কেউ নেই। রাজশাহীর সাইদুল সিলেটি ছেলে। ওকে বলি, আমাদের লোক কোথায়- খুঁজতে হবে। আমার পিঠে ৯টা গ্রেনেড বাঁধা। আমার ডিফেন্সে ব্রাশ করলাম। দেখি কেউ নেই। হঠাৎ দেখি সবাই পরোটা খাচ্ছে। বললাম, 'কিরে বাবা? তোমরা কোথায় ছিলে? ইউ.কে এখনো মরে নাই। তোমরা কেন যুদ্ধে এসেছো?' হাবিলদারকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন ওদের জিজ্ঞেস করলেন না, এভাবে কেন বাঙ্কার খালি করে চলে এসেছে?

রিসিভার নিয়ে বললাম, 'হাবিলদার ইউ.কে বলছি এই ঘটনা...' জবাব এলো 'অস্ত্র সব রেখে তাদের নিয়ে চলে আসেন। অস্ত্র রেখে তাদের নিয়ে ভারতে গেলাম। ভারতীয় মেজর, যার বাড়ি বাংলাদেশের বগুড়ায়। আমাকে বললেন, 'দেশকে স্বাধীন করতেই হবে আপনাদের।' আমি বললাম, অস্ত্র কোথায় পাবো? বললেন 'অস্ত্র আমি দেবো।' সব রাশিয়ান অস্ত্র। টমি গান, এলএমজি।

বাঘবান্ধার যুদ্ধ শুরু

দুই রাত ভারত সীমান্তে জঙ্গলে কাটালাম। ঠিকই অস্ত্র পৌঁছে গেল হাতে। বাঘবান্ধায় ডিফেন্স নিলাম। ঝিরি আছে, বাঁশের পুল। পাকবাহিনী দেখে প্রচন্ড বম্বিং হয়। আল্লাহপাকের ইচ্ছা। কেউ মরিনি। ব্রিটিশ আমলের পাকা সড়ক। দুই পাশে দুটা শেল্টার, বাঙ্কারে ২টা এলএমজি ফিট করলাম। সামনে মাটি দিয়ে ১২টি উঁচু পাচিল তুলে দিই। রোড ব্লক হয়ে যায়। যাতে পাকবাহিনী তাড়াতাড়ি এসে আক্রমণ করতে না পারে। রাস্তার পাশ থেকে হ্যান্ড বোমে সেফটিপিন সোজা করে গেঁথে তার দিয়ে আস্তে করে আটকে দিলাম। একটু লাগলেই যেন ফেটে যায় গ্রেনেড । আমাদের লোকদের সতর্ক করলাম এটা শত্রুর জন্য তৈরি করা হয়েছে। কোনো রকমে এক রাত থাকলাম পরের রাত থেকে বম্বিং শুরু হয়ে গেলো।

আমাদের অবস্থান তখন ভুরুঙ্গামারী বাজার থেকে এক মাইল দূরে। পরদিন ভারতীয় বাহিনী এলো। ১ ক্যাপ্টেন, ১ মেজর, ১ সিগন্যালম্যান। 'এখানে কে আছে?' পাঞ্জাবি রাজপুত, পিঠে ওয়্যারলেস বাঁধা।

স্যালুট দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললাম- 'রাইট মুক্তিফোর্স উক্য হ্যায়।' প্রশ্ন করলেন, 'পাকবাহিনী কিত্না দূর হ্যায়?' তিনজনকে আস্তে আস্তে সঙ্গে নিয়ে ঠিক পাকবাহিনীর বাঙ্কারের সামনে চলে গেলাম। ৫০০ গজের মধ্যে দেখলাম একটা বাঙালি মেয়ে পরোটা বানাচ্ছে। দূরবীন দিয়ে দেখা যাচ্ছে। অর্ডার হলো 'পজিশান নাও, তিনটা বাঙ্কার করো। পারবে?' সম্মতি দিলাম। তারা ৪টায় আসবেন বললেন। আমি নিজে লোক নিয়ে সব তৈরি করলাম।

বাঙ্কার দেখে খুব খুশি ভারতীয় বাহিনী। বললেন, 'আচ্ছা বানায়া!' ওদের বললাম রাতে যেন একটা গুলিও না করে। ভারতীয় বাহিনী ধীরে ধীরে অ্যাডভান্স হবে। রাতভর ভুরুঙ্গামারী তছনছ। রাজাকার, পাকিস্তানিরা সব ঘর থেকে মেয়েদের নিয়ে যায়। সব এলাকা ছাড়া। এদিকে ভারতীয় বাহিনীও পাক বাঙ্কার তছনছ করে দেয় একটানা হামলায়।

জেনারেল অরোরার সঙ্গে

'৭১-র অক্টোবরের কোনো এক সকালে জিপ নিয়ে অরোরা এলেন। মুখে পাইপ, হাতে লাঠি নিয়ে ভারতীয় বাহিনী প্রধান। তার সামনে গিয়ে স্যালুট দিয়ে বললাম 'রাইট, মুক্তিফোর্স ইউ.কে. হ্যায়'! 'ঘর কিধার, কোন জাতি?' বাঙ্কার দেখে খুব খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সব। হাত মিলিয়ে বুক মিলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'রোড ব্লক কেন?' বললাম পাকবাহিনী যেন এগোতে না পারে, তাই।'

শাড়িপরা পাকিস্তানি বন্দি!

এভাবে দিনে দিনে অনেক অ্যাডভান্স হলাম। অ্যাম্বুশ করে চৌধুরীহাট থেকে কুলাঘাট, পাখিউড়া, কাউয়াহাগা ঘাট পেরোলাম। কয়েকজন বাঙালি ধান কাটছে। দেখি দুই পাঞ্জাবি শাড়ি পরা। ধরে বাঁধলাম। গরুর রশি দিয়ে বেঁধে বললাম 'কিত্না বাঙালি আওরৎ কো খারাপ কারনা- বোলো?' এরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাঙালি মেয়ে খুঁজেছে আর নির্যাতন করেছে। এরা ক্ষমা চাইলো। বললাম, 'এদের বন্দি করলে দেশ স্বাধীন হলে এদের ফেরত দিয়ে ১৫ জন বাঙালি সেনা ফেরত আনবো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে।' ভারতীয় ক্যাম্পে নিয়ে গেলাম এদের। রাজপুত সেনা এলো। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো- কিভাবে পেলে? বললাম অ্যামবুশ্ করে। সকালে পুরো পাড়া জ্বালিয়ে দেয় পাকিস্তানি বাহিনী তাদের দু'জন সৈন্য ভারতীয় সৈন্যের হাতে বন্দি হবার ক্ষোভে। কোনো পুরুষ রাখেনি। কচুক্ষেতে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যায় এক বৃদ্ধ আর এক শিশু।

৩২ নারীকে উদ্ধার

হঠাৎ বাচ্চার কান্না কানে আসে। নদীর তীরে এ শব্দে নৌকা পাঠিয়ে বলি- দেখে আয় কোনো পাঞ্জাবি সেনার কৌশল কি-না। নৌকার মাঝি বললো বাঙ্কারে ঢুকে কিছু মেয়ে লুকিয়ে আছে। রাত তখন ১১টা। মাঝিকে পাঠালাম, যেন বলে 'মুক্তিফৌজ হাবিলদার আছে, তোমাদের পার করবে, চটপট চলে এসো। রাতে স্থানীয় মাতবরদের দিয়ে রান্না করিয়ে তাদের খাওয়াই। বললাম, 'তোমরা আমাদের মা, তোমাদের পেটে আমরা জন্মেছি। তোমাদের গ্রামে সব পুরুষকে মেরে ফেলেছে। নির্যাতিত হয়েছো তোমরা, আমাদেরও খুব কষ্ট'। নৌকা লাগিয়ে সকালে শরণার্থী ক্যাম্পে ৩২ নারীকে পৌঁছে দিই। সঙ্গে ৩টি ম্যাগাজিন আর ১টা এলএমজি নিয়ে পাহারা দিই। তাদের রাতে স্কুল ঘরে রেখেছিলাম। এই ৩২ নারী আমাকে বলেছিলো, 'দেশটাকে স্বাধীন করতে পারলে আমাকে নিয়ে যাবেন।'

ভুরুঙ্গামারী থেকে আবার চৌধুরীহাট

ভুরুঙ্গামারী থেকে চৌধুরীহাট গেলাম। এক রাত খুব কষ্ট করেছি। রাতভর যুদ্ধ

হলো। সকালে দেখি মানুষজন নেই। রাতে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়েছে। সিপাইদের ডেকে এগোলাম। যেদিকে বোম পড়েছে সেদিকেই যাচ্ছি। জানি পাকিস্তানি বাহিনী পেছন ফিরবে না- শুধু সামনে বোম ফেলবে। চৌধুরীহাটের কাছাকাছি। সকালে সবাইকে ডাকলাম, ‘হাবিলদার উক্য এখনো জীবিত, সবাই আসো।’ দেখি লে. সামাদকে। বললেন, আপনি রাইট মুক্তিফৌজ, ডানে যান। সকালে দেখি সামাদ মারা গেছে। ওমা! মনটা খারাপ হলো খুব। তার পিঠ থেকে লম্বা গুলি বের হলো। দু’জন নিয়ে তার লাশ কম্বলে পেঁচিয়ে রাতে ক্যাম্পে নিয়ে আসি। সকালে জানাজা পড়ে কবর দিই। এখনো ভুরুঙ্গামারীতে লেখা আছে- ‘সামাদ নগর’। ওর কথা মনে হলে কান্না আসে। আমার সঙ্গে যদিও শেষ পর্যন্ত থাকতো!

আবার চৌধুরীহাট

ভারতীয় সেনাবাহিনী এলো ক্যাম্পের খোঁজে। কোথায় 6 পয়েন্টের ছোট কামান আছে জানতে চায়। ২টি ক্যাম্পে ১ কমান্ডারসহ ৭ পাকিস্তানি সেনার দেখা পেলাম। আমি একজন, ১২ জন ভারতীয় সেনা। ঐ ৭ পাকিস্তানি সেনাকে ধরলাম। ৭ জনের প্যান্টের বোতাম খুলে পুরুষাঙ্গ কেটে নিয়ে গেলাম রাস্তার ওপর। নিরীহ বাঙালিদের ওপর তাদের বর্বরতার এই শাস্তি। রাস্তা ব্লক করে দেয়াতে পাকিস্তানি বাহিনী আর এগোতে পারেনি।

তিস্তায়

তিস্তা রেলস্টেশনের দিকে পুরো কোম্পানি অ্যাডভান্স হলাম। স্টেশনের লোকেরা বললো আপনাদের জন্যে খানা তৈরি। সিপাহিদের বললাম, তোমাদের সাবধানে যেতে হবে। Gap দিয়ে যাও, মর্টার থাকতে পারে। ফুটবে। ডানে-বাঁয়ে করে একেকজন হাঁটলাম, আমি সামনে। জানি বড় গাছের নিচে গাড়ি থামে। দাঁড়ালাম, দেখি মাটিতে মাইন বসানো খাড়া করে। আস্তে করে হাতে নিয়ে ‘Yes’কে ‘No’ করে ঘুরিয়ে দিই। এই মাইন পুরো চার্জ করা ছিল। আমার পেছনে মিত্র বাহিনী।

মিত্রবাহিনীর গাড়িবহর দম দম করে ঢুকছে। থামালাম। মেজর নেমে বললেন, ‘কেন থামালে? তোম কৌন?’ বললাম, ‘হাবিলদার ইউ. কে. মুক্তিফোর্স। দেখুন এটা কি?’ ১২টা ল্যান্ড মাইন পেলাম; দেখালাম। আঁৎকে উঠে মেজর বললেন, ‘আপ কা নাম ইউকে হ্যায়? বাপরে বাপ! মেরা ফোর্স কো আপনে বাঁচায়া! আজ সব মরে যেতো’। খুব খুশি হলো। নাম লিখে নিলো- বুকে জড়িয়ে ধরলো। একদিন ভুরুঙ্গামারীতে লে. জে. অরোরা বলেছিলেন, ‘তুমি যেভাবে লড়াই

RxY ewoi mvg‡b Amgvß wfËc¨‡ii cv‡k mRj `wó‡Z ZvwK‡q Av‡Qb DK¨ wPs exi weµg

করছো, আমার ফোর্সও জানে না। তোমার দেশ আমি স্বাধীন করে দেবো- তুমি যাবে আমার সঙ্গে?’ বললাম, আমার বৌ, মা, সন্তানরা কেমন আছে জানি না, বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না- আমি কোথাও যাবো না।’ বললেন, ‘ছুটি নাও!’ আমি আমার মাটি ছেড়ে কোথাও যাইনি, কেন যাবো?

দেশ স্বাধীন হবার আগ মুহূর্তে ৩ পাকিস্তানি সৈন্য খতম

১৫ ডিসেম্বর ’৭১, রাতে এসএলআর হাতে নিয়ে ডু-ডু-ডু-ডু মারছি ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার। তিস্তা পারে রেললাইনে বাঙ্কার করে থাকি ২-৩ রার। ঘোষণা হলো রাত ৯টার পর থেকে কোনো ফায়ারিং করবে না। মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। কিছু দূরে দেখলাম ৪ জন পাকসেনা। ১০০০ গজ দিয়ে অস্ত্র ছাড়লাম। বিহারি বেশি খতরনাক ছিল। পাঞ্জাবিরা যুদ্ধক্ষেত্রে কাউকে ক্ষমা করেনি। ৪ জনের ৩ জন চলে গেলো, শেষ। অনেককে বাঁচিয়েছি। কিছু ক্ষেত্রে ওদের বর্বরতা বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলো।

বিজয় দিবসে পুরো বাহিনী জীবিত স্বাধীন দেশে

দেশ স্বাধীন হলো। বিজয় দিবস। তিস্তা পার হলাম। রেলওয়ে স্টাফরা খানা তৈরি রেখেছে। ২টা গরুরগাড়ি নিলাম। ভারতীয়সহ ২০০ ফোর্স। ওদের দায়িত্ব ওদের, আমার নয়। আমার ৪০-৫০ জনকে নিলাম। সন্ধ্যা ৬টায় রওয়ানা দিয়ে রাত ১১টায় পৌঁছি রংপুরে। দেখি সব বেডফোর্ড গাড়ি। কলেজে গেলাম। দেখি কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আরব আলীসহ সবাই। স্বাধীন দেশে সবাইকে নিয়ে আমাকে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। এখন তিনি বেঁচে আছেন কি না জানি না। যুদ্ধের ৯ মাসে আমার বাহিনীর শুধু তিনজন মারা গেছে, নাম মনে নেই। আমার নির্দেশের বাইরে তারা স্বেচ্ছায় বম্বিংয়ের মধ্যে বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় মারা গেছে মর্টারে।

সকালে রংপুর হালিশহর বিডিআর ক্যাম্প থেকে কলেজে গেলাম বিজয় দিবসে আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সৈন্যদের দেখতে। ৩৫০-র বেশি পাকিস্তানিদের মাঝ থেকে পাঞ্জাবি সুবেদার সমুন্দর খান চেঁচিয়ে বললো ‘বাঞ্চোৎ কা বাচ্চা ইউকে চিং, আভি জিন্দা হ্যায়?’ আমিও চেঁচিয়ে বললাম ‘তোমার সঙ্গে হকি খেলেছি, তুমি মরোনি, আমি মরবো কেন? তোমারা পাস্ হাতিয়ার হ্যায়? আমার হাতে আছে। তোমাদের মারবো বলেই তো যুদ্ধ করেছি।’

এভাবেই শেষ হয় নিজের মুখে উক্য চিং বীর বিক্রমের বীরত্বগাথা।

দুঃখ করে তিনি আরো বলেন,“ওসমানী আমাকে বলতেন, ‘হকি, জুডো, রেসলিং সব তুমি জানো, এসব শেখাবে ছেলেদের।’ মেজর জিয়া আমাকে চিনতেন। অথচ এখন আমি দীনহীন উপোস পড়ে থাকি। আমার মেডেল কি আপনি এনে দিতে পারবেন? সাপ্তাহিক ২০০০ আমার ছবি দেবে, আপনার সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা, তিনি কি বলবেন আমার মেডেলটা দিতে?”

গত নবেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি সিএনজির জন্যে আবেদন করেছেন। সেটা কি অনুমোদিত হবে?

বাংলাদেশের ১৭৫ জন বীর বিক্রমের তালিকায় ১০০ নম্বর তালিকাভুক্ত উক্য চিং বীর বিক্রমের সার্টিফিকেটে তার নাম ভুল, যা ক্ষমার অযোগ্য। যে মেধাবৃত্তি চালু হয়েছে, সেখানেও তার নাম ভুল। মেডেলের খালি বাক্স নিয়ে বসে আছেন, হয়তো প্রতিরূপ পাবেন একদিন। হয়তো নির্মীয়মাণ সড়কটি তার নামে হবে। হয়তো তার বাড়ির সামনে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে একদিন, হয়তো তার ২ মেয়ে এক ছেলে এবং পরবর্তী প্রজন্ম সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকবে এ সমাজে। এমন ভাঙা ঘরে দীনহীন হয়ে নয়। শহর থেকে তিন কি.মি দূরের লেংগিপাড়া হতে পারে উক্য চিং বীর বিক্রমের নামে। এ সবই শুধুই স্বপ্ন। দায়সারা দায়িত্বের এ দুর্ভাগা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি কর্তব্যে কখন দায়বদ্ধ হবো আমরা? উক্য চিং কি তার জীবদ্দশায় সেটা দেখে যেতে পারবেন?